বিশেষ ক্রোড়পত্র

"টেকসই আগামীর জন্য
জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য"

৮ মার্চ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২

সৌজন্যেঃ এসকেএস ফাউন্ডেশন

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অঙ্গীকার হোক জেন্ডার সমতার মধ্যদিয়ে টেকসই সমাজ গঠন

'টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য' এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আজ ৮ মার্চ গোটা বিশ্বে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবস উপলক্ষে নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের মধ্যদিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জেন্ডার সমতা আনয়নের লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশন সরকারের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক ভূমিক পালন করে যাচ্ছে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এসকেএস ফাউন্ডেশন সরকারের বিভিন্ন নীতিমালার সাথে সমন্বয় রেখে সংস্থার নিজস্ব জেন্ডার নীতিমালাসমূহ আন্তরিকভাবেই অনুসরণ করে আসছে। শ্রদ্ধাবোধ, জবাবদিহিতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, ন্যায়পরায়নতা, স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব এই ছয়টি মূল্যবোধের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা মূল্যবোধটিও বিশেষ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও এসকেএস ফাউন্ডেশন অগ্রাধিকার ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনায় থিমেটিক বিষয়ের মধ্যে সোশ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজিং থিমের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা তৈরীতে এসকেএস বরাবরই সোচ্চার। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অঙ্গীকার হোক জেন্ডার সমতার মধ্যদিয়ে টেকসই সমাজ গঠন।

রাসেল আহম্মেদ লিটন, নির্বাহী প্রধান, এসকেএস ফাউন্ডেশন।

লিঙ্গীয় পক্ষপাত নিপাত যাক

-সাদিয়া আফরিন, রিসার্চ প্রফেশনাল, সাউথ অস্ট্রেলিয়া

ধরা যাক আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন কিছু বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত আছে যে ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা কিছু সমরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সুবিধা দিতে পারবো। তো এখন আমরা কী করবো ? আমরা অনেকেই চাইবো আমাদের পছন্দের ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত হোক। এজন্য আমরা প্রথমেই যা করবো তা হলো সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবো- কেন তারা সেই বিশেষ সুবিধা ভোগের উপযুক্ত, ঠিক উল্টোটাই করবো যাকে বা যাদেরকে সমরূপ সুবিধা দিতে চাইনা- বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবো কেন তারা অনুপযুক্ত।

দ্বিতীয়ত, আমরা যাকে বা যাদেরকে সুবিধাভোগী করতে চাই সে বিষয়টি সবাই যাতে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয় সেজন্য আমরা সুবিধা প্রদানের নিয়মকে এমনভাবে তৈরি করবো যাতে এটি ন্যায্য মনে হয়। এরপর আমার পছন্দের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিরবচ্ছিন্ন সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য যুক্তি এবং সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে পুরো ব্যবস্থাকেই দাঁড় করানোর চেষ্টা করবো যাতে করে ঐ ব্যবস্থা ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বপক্ষে কাজ করে। এই যে কোনো এক পক্ষকে লাভবান করিয়ে অপরপক্ষের প্রতি রূঢ় আচরণ করা এটিই সাধারণ অর্থে পক্ষপাত করা। পক্ষপাত মূলত একটি চলমান প্রক্রিয়া। অসীম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রচারণা প্রতিপাদ্য হলো 'Break the Bias', যার একটি বাংলা হতে পারে 'পক্ষপাত নিপাত যাক।' বলাই বাহুল্য এই পক্ষপাত লিঙ্গীয় পক্ষপাত। সাধারণ অর্থে, লিঙ্গীয় পক্ষপাত হলো কোনো একটি লিঙ্গকে অপর লিঙ্গের চাইতে বেশি প্রাধান্য দেয়া। বেশি প্রাধান্য দেয়া মানে, আগেই উল্লেখ করেছি, কারও প্রতি পক্ষপাত থাকা, তাকে বিশেষ সুবিধা দেয়া বা দিতে রাজি থাকা।

কেন লিঙ্গীয় পক্ষপাত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ? কেনই বা লিঙ্গীয় পক্ষপাত নিপাত যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে ? ভাবা হচ্ছে কারণ, আমাদের সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্ক মূলত পক্ষপাতের সম্পর্ক। আর পক্ষপাতের সম্পর্ক বলেই লিঙ্গীয় সম্পর্ক অসম। বৈষম্যমূলক। অথচ এই অসম সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, ধর্মের মত গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করি তাতে লিঙ্গীয় পক্ষপাত মানেই পুরুষ পক্ষপাত। ফলে নারী ও ট্রান্সজেন্ডারসহ প্রত্যকটি বর্গ এই পক্ষপাতিত্বের নেতিবাচক ফলাফল ভোগ করে, এমনকি পুরুষও এর বাইরে না।

লিঙ্গীয় পক্ষপাত এক অর্থে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলধন। যার ওপর ভিত্তি করে লিঙ্গীয় সম্পর্ক সুদে-আসলে ফুলে ফেঁপে বিস্তৃত হয়। কারণ এই পক্ষপাত ঠিক করে এই ব্যবস্থায় কার কি ভূমিকা হবে। ঠিক করে কে কতটুকু অধিকার ভোগ করবে। একইভাবে কে কতটুকু বঞ্চিত হবে, এবং কে একেবারে বাদ পড়ে যাবে।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন একটি বিশেষ লিঙ্গকে পক্ষপাতমূলক আচরণ করার জন্য বেছে নেয় তখন এই পক্ষপাতমূলক আচরণের সমর্থনে নানাবিধ কলাকৌশল অবলম্বন করে। প্রথমত, এটি সব লিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য দাঁড় করায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোতে মোটের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়, যেমনঃ পুরুষ রক্ষক। পুরুষ শক্তিশালী। পুরুষ সাহসী। বিপরীতে তুলে ধরা হয় নারীর ক্ষুদ্রত্ব। যেমনঃ নারী পোষ্য। নারী দুর্বল। নারী ভীতু। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার বর্গের লোকজনের জন্যও ব্যবহৃত হয় নানাবিধ নেতিবাচক ভাষা। যেমনঃ হিজড়ারা খুব ধুরন্ধর।

এই যে পুরুষের সাপেক্ষে অন্যান্য লিঙ্গের প্রতি আমাদের চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গী সেসব আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপনে, চলতে ফিরতে অহরহই প্রকাশ করে থাকি। এটি করতে গিয়ে আমরা মূলত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে পড়ি এবং সেইসব চিন্তা-ভাবনাকে সমাজে টিকে থাকার অনুমোদন দেই। এই কাজটি করার জন্য আমরা ব্যবহার করি আমাদের নিত্যদিনের ভাষা। উপমা। বাগধারা। যেমনঃ বেটার জিদে বাদশা, বেটির জিদে বেশ্যা! এখানে স্পষ্ট লক্ষ্যণীয় যে নারীর জেদকে তার চরিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেখা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে যে নারীর সমভ্রমই নারীর মূখ্য পরিচয়। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। জেদ বরং পৌরুষ প্রকাশক যেখানে সমভ্রম কোনো ইস্যুই নয়। পুরুষকে আমরা সুবিধাভোগী করে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত পৌরুষদীপ্ত করে সাজাই, তার গুণগান গাই এবং সুন্দরভাবে তুলে ধরি। এমনকি সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আপাতঃ 'যোগ্যতর' না হলেও তার প্রতি পক্ষপাত বন্ধ করি না। যেমনঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন নির্দিষ্ট পুরুষের বিশেষ কোনো সমস্যা নিয়ে আলাপকালে বলা হয় সোনার আংটি বাঁকাও ভালো। মানে পুরুষের সমস্যা আসলে কোনো সমস্যা না। অন্যদিকে নারী, যাকে আমরা সমরূপ সুবিধা দিতে রাজী থাকিনা তাদেরকে অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে অথবা ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করি। যেমনঃ কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। অর্থাৎ কন্যা মানেই দায়। আবার ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে আমরা অহরহই বলি এদের জ্বালায় রাস্তাঘাটে চলাফেরাই দায়! অথচ ট্রান্সজেন্ডার মানুষের সামাজিক, (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

নারী দিবসের প্রেক্ষাপট ও এবারের প্রতিপাদ্য

উম্মে কুলছুম ইলা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বর্তমানে নানা আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। জেনে নেয়া যাক, নারী দিবস কেন পালন করা হয়, এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যই বা কি এবং এবারের নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে আমাদের নারীদের অবস্থান।

শ্রমিক হিসেবে নারীরা ছিল ভীষণ অমানবিক আচরণের শিকার। স্বল্প মজুরি দিয়ে তাদের শ্রম কেনা হত; নির্ধারিত ছিলনা শ্রমঘন্টাও। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা উপযুক্ত বেতন, উন্নত কর্ম পরিবেশ ও ১০ ঘন্টা কর্মদিবসের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে। হাজার হাজার নারী শ্রমিকদের মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ। গ্রেফতার হন অসংখ্য নারী শ্রমিক। জোরদার হতে থাকে আন্দোলন। এর প্রায় তিন বছর পর ১৮৬০ সালে সুই কারখানার নারী শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব ইউনিয়ন গঠন করেন। একত্রিত হতে থাকে অন্যান্য নারী শ্রমিক দলগুলোও। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৯ সালে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন বক্তৃতায় সর্ব প্রথম নারী পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এরপর ১৯০৭ সালে স্টুটগার্টে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৫টি দেশের ৫৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ সালেই আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্লারা জেটকিন তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনেই নারীদের ভোটাধিকারের দাবী জোরালো হয়ে ওঠে। এরপর ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্কে শ্রম ঘণ্টা কমানো, মজুরি বৃদ্ধি ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের দাবিতে প্রায় ১৫,০০০ নারী ও অভিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঐ দিবস স্মরণে 'সোসালিস্ট পার্টি অব আমেরিকা' ১৯০৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ব্যাপী 'জাতীয় নারী দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়। একই বছরের নভেম্বর মাসে ট্রায়াঙ্গেল শার্ট ওয়েস্ট কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেন। ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণে এ ধর্মঘট চলে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সে বছরের 'মে দিবসে' ৬০ হাজার শ্রমিক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। সবদিক থেকেই এ আন্দোলনের প্রভাব ছিল প্রচুর। শ্রমিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ যেমন বৃদ্ধি পায়, নারী-পুরুষের ভোটাধিকারের দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছিল।(২য় পৃষ্ঠায়)

নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয়

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু

পুরুষতান্ত্রিকতা সমাজের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অত্যাধুনিক এই সভ্যতার যুগে আমরা এখনও মানুষকে বিভক্ত করে দেখি; নারী ও পুরুষকে বিভেদ করে বরাবরই নারীকে বৈষম্যের শিকার হতে বাধ্য করি। কিন্ত দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং দেশের উন্নয়নে মানুষকে নারী-পুরুষ, জাত-পাত, ধর্ম-গোত্রে আলাদা করা যাবেনা কখোনই। হাজার বছর ধরে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আটকে আছে নারীর মানবাধিকার, আটকে আছে নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার। কেন অবহেলা, কেন অবজ্ঞা, কেন নারীকে মানুষ মনে করা হচ্ছে না সেটাই বোধগম্যের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমাজে। যদি বলি নারী কারা? আমি কেন, সকলে বলবেন- নারী আমার শ্রদ্ধেয় মা, নারী আমার শ্রদ্ধেয় খালা-চাচী, ফুফু, আমার শ্রদ্ধেয় বড় বোন, স্নেহের ছোট বোন, আমার স্নেহের কন্যা এবং আমার প্রিয়তমা। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ বলতে পারবেন না, যে তিনি মায়ের পেটে ছিলেন না। তাই নারী হচ্ছে মা জাতি।

নারীরা যেমন সমাজে পেছনে পড়ে আছে, তেমনি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি সবসময় আড়ালে থেকে যায়, লজ্জার বিষয় হয়ে রয়, অবহেলার শিকারে পরিণত হয়। যেহেতু বায়োলোজিক্যাল এবং প্রকৃতিগত কারণে নারীকে পেটে সন্তান ধারণ করতে হয়, তাই এই বিষয়টিকে খুব গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে, যে মা পেটে সন্তান ধারণ করতে গিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি সমস্যার সম্মুখিন হন। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী এখনও পরিবারে প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন স্বাস্থ্য কি সে বিষয়ে জানানো হয় না; বিষয়গুলি লজ্জার বিষয় বলে ঢেকে রাখা হয়। কিন্ত এই লজ্জা করতে গিয়ে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় কিশোরীদের। মাসিক ব্যবস্থাপনা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। মাসিকের সময় কি করণীয় তা জানানো হয় না। ফলে নানান রোগের মুখোমুখি হতে হয় কিশোরীদের। এসব অজানা ও লজ্জার বিষয় বলে অজানা ও অন্ধকারে থেকে দিনে দিনে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের ধারণা না থাকার কারণে এবং লজ্জা ও সামাজিক কারণে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া কিশোরীরা অল্প বয়সে পেটে সন্তান ধারণ করছে। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যাচ্ছে অনেক মা যাদের মধ্যে কিশোরী মাতার সংখ্যাই বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সার্ভে রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, বছরে প্রতি মিলিয়নে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী মৃত্যুবরণ করেন সন্তান ধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতায়।

আমাদের দেশে নারীর মৃত্যুহার কমাতে ও নারীর যৌন স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যাপক ধারণা লাভ করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। সেই সাথে আমাদের দেশের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যে সমস্ত সেবা সরকার দিয়ে তাকে সেই সেবার শতভাগ নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে নারীদের সেবাগ্রহণে প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীর মানবাধিবার রক্ষায়। পাঠকের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য, যৌন স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য কি সে বিষয়ের ওপর কিছুটা ধারণা এখানে উল্লেখ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে- স্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র শারীরিক সুস্থতা ও রোগ থেকে মুক্ত শরীরকে বুঝায় না, এবং পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকে বুঝায়। নিজেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, জীবাণুমুক্ত এবং সুস্থ রাখার উপায় হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা। কোনো নারীর সন্তান ধারণের শুরু থেকে বা মাসিকের সময় থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় বা তার কিছুদিন পর পর্যন্ত প্রজননতন্ত্রের স্বাস্থ্যগত অবস্থাকে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে- প্রজনন স্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ মাতৃত্ব, নবজাতকের যত্ন ও পরিচর্যা, খাদ্য ও পুষ্টি এবং যৌন ও প্রজননতন্ত্রের রোগ ও করণীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ও অতীব প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাসিক একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সাধারণত বয়:সন্ধিকালে প্রতিটি মেয়েরই মাসিক হয়। মাসিক ভয় কিংবা লজ্জার বিষয় নয়। মাসিক বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন: ঋতু, ঋতুস্রাব, পিরিয়ড, মেন্সট্রুয়েশন ইত্যাদি। মাসিক মেয়েদের প্রজনন বা সন্তান ধারণের সক্ষমতার বহি:প্রকাশ। মাসিক নিয়ে আমাদের সমাজে কিছু ভুল ধারণা ও কুসংস্কারের কারণেই মাসিককে মেয়েদের একান্ত ব্যক্তিগত, গোপনীয় ও লজ্জার বিষয় বলে মনে করা হয়। ফলে প্রতিনিয়ত অসংখ্য নারী নানা রকম জটিল অসুখ বা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কিশোরীর অধিকার

মোছাঃ লাভলী খাতুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে নারীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানানো হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষে সমাজের সর্বস্তরের নারীদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিবাদন! আগামী দিনের পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠার অপেক্ষারত কিশোরীদের প্রতি বিশেষ অভিবাদন! ইউনিসেফের সর্বশেষ তথ্য মতে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১১% কিশোরী। অথচ তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার দিকটি এখনও উপেক্ষিত। এ অবস্থায় পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ সকলকেই কৌসুলি ভূমিকা পালন করা দরকার। শিশু বয়স থেকে কৈশোরে পদার্পনের সময় পর্যন্ত একজন কিশোরীর শারীরিক গঠন ও মানসিক উভয় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে তারা যেমন দ্রুত বেড়ে ওঠে তেমনি তাদের চিন্তা চেতনায় দেখা দেয় ব্যাপক পরিবর্তন। এ সময়ে কিশোরীর আত্মপরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করে। আত্মপরিচয় বলতে বোঝায় তার নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণের জায়গা, তার পছন্দ-অপছন্দ, সে কি চায়। এছাড়া নিজের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে জীবনের এ পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে। আর এই পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের জন্য প্রয়োজন হয় পুষ্টিকর খাবার, শিক্ষার সুযোগ, পছন্দ মত পোশাক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিকশিত হওয়ার জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র।

কিন্ত আমাদের সামাজিক অবস্থানে আমরা কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতন থাকলেও তার মানসিক বিকাশের জায়গাটিকে অবজ্ঞা করি। একজন কিশোরীর যে আলাদা সত্ত্বা আছে, তা আমরা বেমালুম ভুলে যাই। তার সেই সময়ে আলাদা যত্নের প্রয়োজন, সেদিকে আমরা খেয়াল করি না। কিন্ত সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের দূত হয়ে উঠার জন্য কিশোরীদের সাহায্য করা প্রয়োজন। একজন ছেলে শিশু বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে যে ধরনের সুযোগ, সুবিধা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রদান করে, একজন মেয়ে শিশুর বেলায় তা হয়ে যায় পুরো উল্টো। মেয়ে শিশু বৈষম্যের শিকার হয় জন্মের পর থেকেই। ছোট বেলা থেকে তার পোশাক, খাবার, শিক্ষা, চলাফেরা, পছন্দ কেমন হবে তা পরিবার, সমাজ নির্ধারণ করে। এমনকি সমাজ নির্ধারিত সংস্কৃতির চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা চলে সারা জীবন ধরে। তারই ধারাবাহিকতায় একজন কিশোরী তার বিকশিত হয়ে উঠার সময়েই বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়।

বয়োঃসন্ধিকালের বিষয়টা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করে না, বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যায়। বেশিরভাগ স্কুলেই নেই মাসিককালীন স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা। দীর্ঘ সময় ধরে একই প্যাড বা কাপড় পরার কারণে অনেক মেয়েশিশু ঐ সময়ে স্কুলবিমুখ হয়; যা তার মানসিক বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই; থাকলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী।

আবার আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিশোরীরা রাস্তাঘাটে চলফেরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বাঁধার সম্মখীন হয় যেমনঃ বখাটেদের উৎপাত, যৌন হয়রানীমূলক আচরণ, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা। এ সকল কারণে অল্প বয়সেই মেয়ে শিশুরা বাল্যবিবাহের শিকার হয়। (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ওয়াশ কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্ততা

হাসিনা পারভিন

নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এবং স্বাস্থ পরিচর্যা (ওয়াশ) আমাদের সুস্থ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওয়াশ ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অর্জনকে মাথায় রেখে নতুন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের শতভাগ মানুষ নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের সুবিধা পাবে। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারও তার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও এবং প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ওয়াশ সেবা সম্প্রসারণে কাজ করছে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি টেকসই ওয়াশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। যদিও আমাদের দেশে ওয়াশ কার্যক্রমে এখনও পর্যন্ত নারীদের সম্পৃক্ততাই বহুলাংশে দৃশ্যমান।

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের নারীরাই প্রতিদিন পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যস্ত থাকেন। ইউনিসেফের ২০১৩ সালের একটি জরিপে পানি সংগ্রহে নারী-পুরুষের ভ'মিকার ভিন্নতা দেখা গেছে। প্রায় ৮৯.৬% নারী পরিবারের জন্য পানি সংগ্রহ করেন। অপরদিকে পুরুষদের মাত্র ৪.৬% এই দায়িত্ব পালন করেন। পানি সংগ্রহের জন্য নারী এবং মেয়েরা যাতায়াত করতে যে মূল্যবান সময় ব্যয় হয়, তা তাদের শিক্ষা এবং আয়-উপার্জনের কাজে লাগানোর কথা। আবার মেয়েদের বাড়িতে বা কাছাকাছি ওয়াশ সুবিধার অভাবে অনেক সময় লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাও ঘটে। নিরাপদ পানির অভাবে আমাদের দেশের অনেক পরিবার প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থ পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্বও নারীদের উপর বর্তায়। তাই, বাড়ির আঙ্গিনায় বা কাছাকাছি পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলে নারীরা সহজে পানি সংগ্রহ করতে পারে। তাতে মেয়েদের সুরক্ষা এবং লেখাপড়ার সুযোগও বাড়বে। এ বিষয়ে সমাজের নারী এবং মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও।

গত কয়েক দশকে দেশের কর্মশক্তির বিকাশ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অগ্রগতি বেশ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী। তবে এক সময় নারীর পেশা ছিল গতানুগতিক। কিন্তু বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে পুলিশ, আলোকচিত্রী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায়েও নারীদের অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। যদিও এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীদের অংশগ্রহণের হার এখনও আশানুরুপ নয়। অন্যদিকে, যারা এ পেশাগুলোতে আছেন তাদের দৈনন্দিন মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে মাঠ পর্যায়ের কর্মপরিবেশ ততটা সহায়ক নয়। মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিবেশ কতটা নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত পাবলিক টয়লেটগুলোতে। বলাবাহুল্য, এর অধিকাংশই যেমন নারীবান্ধব নয় তেমনি স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে যেসব নারী কাজ করেন তারা নিত্যদিনের প্রয়োজনে এই টয়লেটগুলো ব্যবহার করতে পারেন না। মাঠে কাজ করা নারীদের এজন্য পোহাতে হয় কষ্ট ও বিব্রতকর পরিস্থিতি; যা আরও বেড়ে যায় তাদের মাসিককালীন পরিস্থিতিতে!

একই বাস্তবতা মাঠ পর্যায়ে নারী ট্রাফিক পুলিশ, আলোকচিত্রী, সাংবাদিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও, সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নারী, প্রতিবন্ধী নারী এবং ট্রান্স জেন্ডার নারীদের ক্ষেত্রে। ২০১৫ সালে ট্রাফিক সার্জেন্ট হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজ পথে কাজ করতে শুরু করেন দেশের নারী পুলিশ সদস্যরা। প্রথম দফায় ২৮ জন নারী সার্জেন্ট (New Age- ৩১ মে ২০১৫) হিসাবে নিয়োগ পান। ২০১৯- এর মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১৪২ জন নারী পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে কাজ করেন (ঘবা অমব- ৮ মার্চ ২০১৯)। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনকারী নারী-পুলিশ সার্জেন্ট বা কনস্টেবলকে সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত দুই শিফটে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে একাধিকবার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ট্রাফিক বক্সে টয়লেটের ব্যবস্থা থাকে না। তাহলে এই ৮ ঘন্টা সময় একজন ট্রাফিক নারী পুলিশ কিভাবে তার শৌচাগারের প্রয়োজন মেটাবেন? এমন পরিবেশে কিভাবে তারা কাজ করবেন? দেশে প্রায় ১ হাজার নারী সাংবাদিকতা পেশায় আছেন (হেসাইন, প্রথম আলো ২০১৯)। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয় এমন সাংবাদিকরাও একই সমস্যায় ভুক্তভোগী। অন্য নারীদেরও কমবেশী এই শৌচাগারের প্রয়োজন মেটাতে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনায় নারীদের নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়।

যদিও, বর্তমানে এই পাবলিক টয়লেট- এর বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা, সেমিনার এবং দিবসগুলোতে আলোচনায় আসছে এবং সমস্যা সমাধানও কমবেশী হচ্ছে। তাই, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে আমাদের নারীদের জন্য এমন অনুকুল কর্মপরিবেশ তৈরী করা যেখানে প্রতিটি ওয়াশরুম ফাংশনাল (অর্থাৎ, ওয়াশরুমের দরজা ঠিক থাকবে, মজবুত লক সিস্টেম, পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, টিস্যু ও ব্যবহৃত প্যাড ফেলার ঢাকনাযুক্ত বিনের ব্যবস্থা ইত্যাদি) থাকবে।

ঘনঘন বন্যা, ভূমিধবস ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে পানির উৎস দূষিত হয়ে পড়ে, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যাই কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে নারীরা মারাত্বক দূর্ভোগের শিকার হয়। এই সময় প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ন্যাপকিন, কাপড়, সাবান, স্যাভলন, পানি এবং সুরক্ষিত ওয়াশরুম বা টয়লেট- এর অভাবে নারীরা মাসিককালীন সময় অনেক কঠিন পরিস্থিতি পার করে। তাই, প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় নারীদের ওয়াশ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া সরকার, এনজিও, বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিবেশীসহ সকলের দায়িত্ব।

আশার আলো যে, বর্তমানে আমাদের নারীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করছে, এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাত ধোয়া, ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি চর্চার সময়, গুরুত্ব, সুফল-কুফল জানতে ও বুঝতে সক্ষম হচ্ছে এবং তারা নিয়মিত পাড়ায় অন্যান্যদের সাথেও বিষয়গুলি আলোচনা করছে। এসকেএস ফাউণ্ডেশন- এর সমতা ও অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় নারীরা নিজেই পরিকল্পনা করে ইট, বালু ও সিমেন্ট সংগ্রহ করে হ্যান্ড ওয়াশিং ডিভাইস- এর জন্য চেম্বার ও বেসিন তৈরী করে পরিবারের সকলেই নিয়মিত ব্যবহার করছেন। নারীরা টিউবওয়েল এবং ল্যাট্রিন- এর কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেদের এবং প্রতিবেশীদের টিউবওয়েল মেরামত- এর কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। নারীরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে নারীদের সাথে মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, হাত ধোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করছেন। পরিবারকে পরামর্শ দিয়ে হাত ধোয়ার প্রযুক্তি ক্রয় ও স্থাপনে সহযোগিতা দিচ্ছেন। নারীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় অনেক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপিত হয়েছে। খোলা জায়গায় মলত্যাগ না করার জন্য নারীরা অল্প খরচে পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরী কারার পরামর্শ প্রদান করছেন, অনেকে তৈরী ও ব্যবহার করছেন।

ওয়াশ উদ্যোক্তা হয়ে এলাকায় নারীরা কাজ করছে। আমাদের নারীরা এখন শুধু হস্তশিল্পই নয়, এনজিও থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়ে আজকের নারীরা কেউ কেউ দোকানে স্যানিটেশন- এর মালামাল রেখে ব্যবসা করছেন, কেউ ব্যাগে করে স্যানিটারী ন্যাপকিনসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করছেন, আবার কেউ অন্য এনজিও- এর সাথে যুক্ত হয়ে স্যানিটেশন- এর মালামাল পরিবারগুলিতে পৌছে দিচ্ছেন। একইভাবে নারীরা উৎপাদন, বিতরণ এবং বিক্রয়ের কাজেও যুক্ত আছেন। এই কাজের মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতীক ভাবে স্বচ্ছল হচ্ছেন। নারীরা সরকারি এবং বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের ওয়াশ সম্পর্কিত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তারা এখন মর্যাদার সাথে এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। নারী নেত্রীরা দলের সদস্যদের নিয়ে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা (ডিপিএইচই, ইউএনও, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য বিভাগ, এলজিইডি), এনজিও এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে গিয়ে ওয়াশ সেবার বিষয়ে আলোচনা করে সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার জন্য নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। এভাবে নারীরা সমাজের পরিবর্তনের বাহক হিসেবে কাজ করছেন।

বিদ্যালয়গুলোতে এখন মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা-এর উপর সেশন পরিচালনা করা হয়। হাইজিন কর্নার এবং মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সীমিত থাকলেও বিদ্যালয়গুলোতে স্যানিটারি ন্যাপকিন রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকার ও বিভিন্ন এনজিও হাইজিন কর্নার এবং মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (ওয়াশ ব্লক) তৈরীর বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা রাখছেন। সরকারের বিভিন্ন নীতিমালায়, মাসিক ব্যবস্থাপনা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য, জেন্ডার সমতা, বয়:সন্ধিকালীন কিশোরী ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-বান্ধব টয়লেট ও মাসিকের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী সরকার কাজ করছে, পাশাপাশি এনজিওগুলোও উদ্যোগী ভ'মিকা রাখছে। এই কাজের অংশ হিসেবে গাইবান্ধায় এসকেএস ফাউণ্ডেশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় ১৮৭টি মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫; জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০০৪; পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৪- এ ওয়াশ সেবার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় নারীদের সম্পৃক্ত হওয়া, ওয়াটসান কমিটিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও সমর্থন করার কথা বলা আছে। এছাড়াও ওয়াশ সম্পর্কিত অন্যান্য গাইডলাইনেও নারীর সম্পৃক্ততার কথা বলা আছে। কিন্তু নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে, যার ফলে স্বাস্থ্য, মর্যাদা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাংলাদেশের নারীরা তাদের মাসিকের সময় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। অন্যদিকে, মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়টি পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার ছাড়াও শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতার সাথে সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক নারী দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদযাপনে নারীরা সক্রিয় ও স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে ভূমকা রাখছেন। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যঃ “টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য”। বর্তমানে নারীরা ওয়াশ কার্যক্রমের একজন পরিবর্তনের সফলবাহক হিসেবে পরিচিত। শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নারীরা এখন এগিয়ে যাচ্ছেন, বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীদের পদচারণা, নেতৃত্বেও নারীরা এগিয়ে। পরিবারের কাজের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের নারীরা। আমরা যদি সত্যিই জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি শক্তিশালী এবং টেকসই ব্যবস্থা তৈরী করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তাহলে নারীবান্ধব ওয়াশ ব্যবস্থা প্রসারের বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারি না।

লিঙ্গীয় পক্ষপাত নিপাত যাক

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অসমতা নিয়ে আমরা খুব কমই কথা বলতে রাজি থাকি।

পক্ষপাতমূলক শব্দ প্রয়োগ, কথামালা, উপমার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আসলে লিঙ্গ নির্দিষ্ট স্টেরিওটাইপের জন্ম দেই এবং প্রতিটি লিঙ্গের কিছু সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য দাঁড় করি। এই স্টেরিওটাইপগুলো দেখতে শুনতে ছাপোষা নির্দোষ মনে হলেও লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবচেয়ে বড় কথা এসবকিছু আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে আমাদের অভ্যাস, আচরণ, ও মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমনঃ কোনো মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে শুনলে এখনও অনেকে নাক কুঁচকান। কিংবা এই সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে কিছুটা সময় নেয়। বিষয়টি এমন যে মেয়েরা ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞান পড়বে বড় জোর। সাহিত্য পড়লেও মন্দ হয়না! অন্তত কলেজে মাস্টারি করে তো খেতে পারবে! কারণ প্রথাগত চিন্তায় নারীর পড়বার বিষয় হবে সফটিকেটেড! এবং কাজের ক্ষেত্র হবে ঘরবাড়ি, সংসার, বাচ্চা সামলে 'করতে পারার মত একটা কিছু।' ফলতঃ এখনও পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা প্রভৃতি পেশায় নারীর অংশগ্রহণ এক তৃতিয়াংশেরও কম। এর পেছনে বড় কারণ হলো জেন্ডার স্টেরিওটাইপ, নারীর সমাজ নির্দেশিত ভূমিকা ও প্রত্যাশা।

অন্যদিকে, এই স্টেরিওটাইপগুলো পক্ষপাতমূলক জ্ঞান তৈরি করে এবং এই পক্ষপাতমূলক জ্ঞান বই-পুস্তক ও শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মিডিয়াও এতে অংশ নেয়। ফলে বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমা সবকিছুতে আমরা সেই জ্ঞানের প্রতিফলন দেখতে পাই। মোদ্দা কথা হলো, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র আমরা একই বাণী পৌঁছে দিতে চাই- কেন পুরুষ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এসব করার মাধ্যমে আমরা আসলে পছন্দের লিঙ্গকে ক্ষমতাধর করে গড়ে তুলি। লিঙ্গীয় স্টেরিওটাইপ উদ্ভূত জ্ঞান সে অর্থে ক্ষমতা ব্যবহারের হাতিয়ার। তেমন একটি জ্ঞানশাস্ত্র হলো পশ্চিমা চিকিৎসা শাস্ত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র পুরুষ আধিপত্যকে মেনে নিয়েই উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। এতে সমাজ নির্মিত লিঙ্গীয় পক্ষপাতমূলক জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে পুরুষের শরীর এখানে সুপিরিয়র এবং নারীর শরীর ইনফেরিয়র। এনাটমিকাল পার্থক্য হিসাবে নারীর শরীর তাই অর্ধাঙ্গ, ক্রটিযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখানে নারীর শরীর বিষয়ক আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রজনন সক্ষমতাকে কেন্দ্র করে, যা নারীর শরীরের একমাত্র কাজ বলেও বিবেচিত হয়েছে। ফলে প্রাচীনকাল থেকে নারীর অসুস্থতা ও রোগ মোটাদাগে তার প্রজনন অঙ্গসমূহকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এবং চিকিৎসা শাস্ত্র, ঐতিহাসিকভাবেই জৈবিক লিঙ্গের সাথে সামাজিক লিঙ্গকে যুক্ত করে এগিয়ে গেছে।

শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নয় আজকে বিশ্বের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই সেই ইতিহাস পুরুষের, HISTORY, HERSTORY নয়। ফলে ইতিহাস হয়ে উঠেছে অধিপতিশীল পুরুষের বয়ান। আজকের বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকেও যদি তাকাই মূল ধারার মিডিয়া, বই-পুস্তক, নাটক, সিনেমায় কেবল পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা। মুক্তিযুদ্ধে বহু নারী সরাসরি অংশগ্রহণ করলেও এই জনযুদ্ধে নারীর অবদান থেকে গেছে সম্ভ্রম সর্বস্ব। ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধা পুরুষ এবং বীরাঙ্গনা নারী একই পাল্লায় তুলনীয় না হওয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এক বহুল চর্চিত দৃষ্টিভঙ্গি।

লিঙ্গীয় পক্ষপাত তাই সর্বব্যাপী প্রপঞ্চ। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, পরিবার, ও সমাজ সর্বত্র চর্চিত বিষয় যা পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন ও ধর্মের মত অন্যান্য ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলিত হয়ে এর অবস্থানকে আরও পোক্ত করে। ফলে ব্যবস্থার অংশ হিসাবে আমরা এর অনুগামী হই এবং পুনরুৎপাদনে অংশগ্রহণ করি। এই অংশগ্রহণও আবার সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দুইরকমেরই হতে পারে।

তবে পুরুষ পক্ষপাত পুরুষের জীবনে সবটা সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেছে- এটি সর্বৈব সত্যি নয়। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ পক্ষপাত আবার পুরুষের জন্য সৃষ্টি করেছে দুর্বিষহ পরিস্থিতিরও। যে পিতৃতন্ত্র পুরুষের স্বার্থে এগিয়ে চলেছে সেই পিতৃতন্ত্র পুরুষের পায়েও পরিয়েছে অদৃশ্য শেকল। দিয়েছে দায়িত্বের বোঝা। দিয়েছে চাপ। এই চাপ পুরুষকে নানারকম মানসিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মধ্যেও ফেলেছে। ফলে দেখা যায় বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারীদের দুই-তৃতীয়াংশই পুরুষ। অন্যদিকে Coronary heart disease (CHD) নারীর তুলনায় পুরুষের মধ্যে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষের ওপর অর্পিত সামাজিক দায়িত্ব, লিঙ্গীয় প্রত্যাশা পূরণের ব্যর্থতা, নিজেকে সমাজ নির্দেশিত পুরুষ হিসাবে গড়ে তোলার, পুরুষালী আচরণ আয়ত্ব করার বা নিজেকে নরম-ভঙ্গুর হিসাবে না দেখানোর সার্বক্ষণীক চাপ নেয় পুরুষ। অনেক সময় এই চাপ মুক্তির জন্য পুরুষালী ইগোকে পুঁজি করে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির অবদমনের প্রকাশ ঘটায় ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মাধ্যমে। সেরকম একটি কাজ হলো বউ পেটানো। মোটের উপর বাংলাদেশে বউ পেটানো গুরুতর কোনো অপরাধ নয়। এর সামাজিক ও ধর্মীয় অনুমোদনও রয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লিঙ্গীয় পক্ষপাত ইতিবাচক কোনো ফলাফল বয়ে আনে না। এতে করে একটি ক্যাটাগরি বিশেষ সুবিধা পায়। কোনো একটি ক্যাটাগরি অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা পায় আবার কোনো বিশেষ ক্যাটাগরি বাদ পড়ে যায়। ফলে যারা সুবিধা পায় তারা সামনে এগিয়ে যায় আর যারা পায়না তারা পিছনে পড়ে থাকে। এ থেকে তৈরি হয় অসমতা। বৈষম্য। কিন্তু বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পক্ষপাত কোনো রাস্তা হতে পারেনা। ফলে লিঙ্গীয় পক্ষপাত ভেঙে ফেলতে হবে। সবার জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈচিত্রময় ও ইনক্লুসিভ সমাজ তৈরি করার লক্ষ্যেই ২০২২ সালের নারী দিবসের ডাক-পক্ষপাত নিপাত যাক।

কিন্তু শত শত বছর যাবত যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে আছে সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা কি এতই সহজ ? সহজ নয়। কেননা মানুষ পক্ষপাতের শিকার হয় এমনকি তার জন্মেরও আগে। প্রথাগত পারিবারিক ব্যবস্থায় ছেলে বেশি যত্ন পাবে, মেয়ে কম। পুরুষ হবে পরিবারের প্রধান। সে আয় করবে, খরচ যোগাবে ফলে সেই সিদ্ধান্ত নিবে পরিবারে কি হবে আর কি হবে না। এমনকি এই একই পক্ষপাত নির্ধারণ করে কে আগে খাবে আর কে পরে। এরপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মাথা হবে একজন পুরুষ। তিনি নেতৃত্ব দান করবেন। সমাজের লোকজন তাঁর কাছেই যাবে্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক শলাপরামর্শ করার জন্য। তিনিই নির্ধারণ করবেন সমাজে কি চলবে, কি চলবে না। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ পক্ষপাত এত গভীরে বিস্তৃত থাকে যে আপাতদৃষ্টিতে লিঙ্গীয় সমতার পুজারী অনেক ব্যক্তি বা পরিবারও শেষ বিচারে পুত্রসন্তানকে কন্যা সন্তানের চাইতে অধিক সম্পত্তি দান করতেই সম্মত থাকেন।

এদিকে আমাদের বিশ্বব্যবস্থা মোটের উপর চলে পুরুষ রাষ্ট্রনায়কদের অধীনে। পিতৃতান্ত্রিক এই বিশ্বে এখন পর্যন্ত খুব কম রাষ্ট্রই রাষ্ট্রনেতা হিসাবে নারীদের স্বাগত জানিয়েছে। এমনকি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারী ক্লিনটনকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে চায়নি বেশিরাভাগ আমেরিকান জনগণ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, জার্মানির মত বেশকিছু রাষ্ট্র সে হিসাবে ব্যতিক্রম। তবে শুধু নারী রাষ্ট্রপ্রধান হলেই যে লিঙ্গীয় অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটে না তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এসব দেশে অহরহই ঘটছে নারী হত্যা, ধর্ষণ, রয়েছে যৌতুকের মত এক সামাজিক ব্যাধি। সর্বোপরি রয়েছে নারীর নির্যাতনের মত ঘটনাগুলোর বিচারের নামে দীর্ঘসুত্রিতা।

পরিশেষে বলতে চাই, পক্ষপাত চিন্তার সাথে জড়িত। দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জড়িত। এই পক্ষপাত সার্বক্ষণীক। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ পক্ষপাত লিঙ্গীয় রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। এই পক্ষপাতের রাজনীতি ঠিক করে কে সামনে থাকবে, কে পেছনে থাকবে এবং কে কোথাও থাকবে না তাই নির্দিষ্ট করে। এই পক্ষপাতকে ভাঙতে হলে তাই সচেতন থাকতে হবে সর্বক্ষণ। যাতে করে আমাদের কথা, কাজ, চিন্তায় এই পক্ষপাত প্রকাশ না পায়। তবে চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গী চিরকালীন কোনো প্রপঞ্চ নয়। এসবের বদল ঘটে। ফলে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী বদলের সাথে সাথে পক্ষপাতেরও বদল ঘটানো সম্ভব। পৃথিবীর সকল কাঠামো, সিস্টেম পুরুষ পক্ষপাতমূলক। এই পক্ষপাত মূলক সিস্টেম পরিবর্তন যোগ্য। অনড় কিছুনা। এই সিস্টেম বদলে দেয়া সম্ভব। পক্ষপাতমূলক সিস্টেম যেমন আমাদের মাথা, চিন্তা-চেতনার দখল নেয় তেমনি আমাদের চিন্তাচেতনা দিয়েও এই পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক বদলে দেয়া সম্ভব। এটিও চলমান প্রক্রিয়া। এরও শেষ নাই। তাই পক্ষপাত প্রতিরোধমূলক প্লাটফর্ম তৈরি করা আবশ্যক। ব্যক্তিগত পরিসরে প্রতিদিন সজাগ থাকতে হবে।

পক্ষপাত মানে ক্ষমতাবানের প্রাধান্য। ক্ষমতাবানের সিস্টেমের সম্প্রসারণ। ক্ষমতাবানের স্বর, ভাষা, আচরণ, জীবনমান সবই স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে প্রচারিত করা। সুতরাং লিঙ্গীয় পক্ষপাত মানে হচ্ছে পুরুষের প্রতি পক্ষপাত, নারী ও অন্যান্য লিঙ্গের প্রতি বৈষম্য।

আমাদের কাজ হবে জেন্ডার পক্ষপাতকে চিহ্নিত করা, সেসব ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া, এবং সেইসব আচরণ চিন্তা থেকে দূরে থাকা। তবে শুধু দূরে থাকলেই হবে না। এর প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে চিহ্নিত করা ও সচেতনতা তৈরি করা। সচেতনতা চৈতন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। চৈতন্য সচেতন বা অবচেতন, দুটোই সংযুক্ত ভাষার সাথে। ভাষা আমাদের চেতনাকে আকার দান করে তেমনি অবচেতনে সেসবের প্রভাব ফেলে। আমাদের ভাষা আমাদেরকে যেমন সহমর্মিতা শেখায়, সমবেদনা জানাতে শেখায়, তেমনি পক্ষপাতও। আমাদের ভাষার পক্ষপাতকে ভাঙতে হবে। নেতিবাচকতাকে ইতিবাচকতা দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। পক্ষপাতমূলক ভাষাকে বদলাতে হবে। ভাষার ক্ষেত্রেও সেই নজরদারী রাখতে হবে। সচেতন ও অবচেতন পক্ষপাতগুলোকে উপড়ে ফেলতে হবে। ভাষা যদি হয় অসমতা, বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার, তাহলে সেই ভাষাকে কিভাবে প্রতিরোধেরও হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় তা ভাবতে হবে। নিজেকে আমূল পরিবর্তনের জন্য সক্ষমতা তৈরি করতে হবে যার লক্ষ্যই হবে লিঙ্গীয় পক্ষপাতহীন পরিবেশ তৈরি করা। একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা। যাতে করে লিঙ্গ বৈচিত্র স্থান পাবে এবং সর্বোপরি অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে সকলের ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়।

কিশোরীর অধিকার

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এক জরিপে উঠে আসে এপ্রিল-অক্টোবর ২০২০ সময়ে ২১টি জেলায় মোট ১৩,৮৮৬টি বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। যেখানে অধিক সংখ্যায় বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয় বরগুনা-১৫১২টি, কুড়িগ্রামে-১২৭২টি, নীলফামারী-১২২২টি এবং লক্ষীপুরে- ১০৪১টি বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়।

২০২১ সালে সরকারি তথ্য অনুযায়ী গত বছরের প্রথম তিন মাসে (মার্চ থেকে জুন) সারাদেশে ২৩১টি বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলীয় জেলা কুড়িগ্রামে সর্বোচ্য ৬১টি বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। নাটোর জেলায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৩টি বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এমনও ঘটনা ঘটেছে পরিবার, সমাজ এমনকি কাজি সহযোগিতা না করায় অনেক বাল্যবিবাহ রোধ করা যায়নি। আবার সমাজে উল্টো চিত্রও আছে বিভিন্ন এনজিও এবং সরকারিভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বিয়েতে দাওয়াত খেতে যেয়ে কিশোরীদের উদ্যোগে পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে। বাল্যবিবাহের শিকার কিশোরী মেয়েদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। প্রথমেই তারা বঞ্চিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ধরনের অধিকার থেকে। স্বামীর বাড়িতে বিভিন্ন কারণে নির্যাতনের শিকার হয়; সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো যৌতুক। এ কারণে অনেক মেয়েকে আত্নহত্যা পর্যন্ত করতে দেখা যায়। অল্প বয়সে গর্ভধারণ এবং গর্ভধারণের কারণে কিশোরী মাতৃমৃত্যুর সংখ্যাও বাংলাদেশে কম নয়। এভাবে চলতে থাকলে আগামীর নারীপ্রজন্ম হবে মেধাশুণ্য, মেরুদন্ডহীন এবং খর্ব হবে তাদের সকল অধিকার।

আওয়াজ তুলতে হবে সকল কিশোরীকে। ভাঙ্গতে হবে সমাজের সকল নীরবতা ও কুসংস্কার। এগিয়ে আসতে হবে গাইবান্ধা জেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের তাল্লুক রেফায়েতপুর গ্রামের উম্মে হাবিবাদের মত, কিশোরীদেরকে সুযোগ দিলে তারা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলায় এমনকি জাতীয় পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি এবং সংসদ সদস্য এ্যারোমা দত্তের কাছে তাদের পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিশোরীদের সমস্যার কথা অকপটে তুলে ধরতে পারে। যাতে করে তাদের অধিকারের কথাগুলো নীতি-নির্ধারকদের কাছে পৌঁছায়। আর কিশোরীদের একটা সুন্দর ও সহায়ক পরিবেশে বেড়ে ওঠার জন্য এবং তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার

সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মাসিক নিয়ে যে সকল প্রচলিত ধারণা আছে তার বেশীরভাগই সঠিক নয়। মাসিক হলে অন্যান্য দিনের মতো সব কাজ করা যায়। মাসিকের রক্ত দুষিত নয়, হরমোনের প্রভাবে প্রতিমাসে প্রাকৃতিক নিয়মে এই রক্ত তৈরী হয় এবং বের হয়ে যায়।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থানার গুরুত্বঃ (১) শারীরিক, যৌন ও প্রজনন সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে (২) মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক না হলে বিভিন্ন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। (৩) সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে সঠিক মাসিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাসিকের সময় প্রতিদিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। শুকনা ও পরিস্কার অন্তর্বাস পরিধান করতে হয়। পরিবার পরিকল্পনা একটি পরিবারের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পিত উপায়ে যে পরিবার গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে। পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সন্তান গ্রহণ করা বা না করা, স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীন ও মুক্ত মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দাম্পত্য জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ বজায় থাকে, পরিবারের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ/ জন্ম বিরতির জন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা বা না করা, সন্তান গ্রহণ করা এবং সংখ্যা নির্ধারণ করা।

নিরাপদ মাতৃত্বঃ নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে তিনটি ধাপে মা ও সন্তানের যত্নকে বোঝায়। গর্ভকালীন যত্ন (মা ও গর্ভের সন্তান), প্রসবকালীন যত্ন (নিরাপদ প্রসব) এবং প্রসব পরবর্তী যত্ন (মা ও নবজাতকের)।

গর্ভকালীন যত্ন বা অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ার (এএনসি): গর্ভকালীন সময়ে একজন মাকে যে যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় গর্ভকালীন সেবা বা গর্ভকালীন যত্ন বা অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ার (এএনসি) বলে। অর্থাৎ গর্ভধারণের সময় হতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে পর্যন্ত মা ও শিশুকে যে সেবা দেওয়া হয়। এর লক্ষ্য হলো মা শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং গর্ভজনিত কোনো জটিলতা দেখা দিলে তাকে প্রতিরোধ করা। গর্ভকালীন সময়ে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশীকরে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

প্রসবকালীন যত্নঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও হাসপাতালে প্রসব করালে ভালো হয়। নবজাতকের নাভী কাটার জন্য জীবাণুমুক্ত ব্লেড বা কাঁচির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অথচ তৃণমূল পর্যায়ে এখনও বাড়িতে ডেলিভারি করানো হয় বেশি। প্রসব একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্ত যে কোনো সময়ে প্রসবজনিত জটিলতা দেখা দিলে দেরি না করে নিকটস্থ ক্লিনিক অথবা হাসপাতালে তাড়াতাড়ি গর্ভবতী মাকে নিতে হবে।

প্রসব পরবর্তী যত্ন বা পোস্টন্যাটাল কেয়ার (পিএনসি) শিশুর যত্নের প্রথম দিন থেকে শুরু করে ৪২ দিন পর্যন্ত প্রসূতি মা ও শিশুর যে যত্ন নেওয়া হয় তাকে প্রসব পরবর্তী সেবা বা পোস্টন্যাটাল কেয়ার বলে। প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে বাড়িতে অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মা ও শিশুকে এই সেবা দেওয়া হয়। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যে নবজাতকের যত্ন ও পরিচর্যার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ১২টি অধিকার হলো-জীবন ও বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার, নারী ও পুরুষের সমতা অর্জন ও সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার, গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, মুক্ত চিন্তার অধিকার, তথ্য ও শিক্ষার অধিকার, বিয়ে সংক্রান্ত ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, সন্তান গ্রহণ করা বা না করা এবং করলে তার সময় ও সংখ্যা নির্ধারণের অধিকার, নিরাপদ ও মানসম্মত স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও উন্নত প্রযুক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকার অধিকার। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই অধিকারগুলো সকলকে জানতে হবে এবং সমাজের সকল পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।